রাষ্ট্রের অপর ভাষায় গল্প

এ অনুবাদের মূল উদ্দেশ্য এ রাষ্ট্রের ভেতর সঞ্চরণশীল অপর ভাষার অস্তিত্বকে একটু জানান দেয়া। নানান কারণে এ ভাষায় লেখা অনেক গল্প অনূদিত গল্পের মত অপূর্ণ, খন্ডিত। পাঠকস্বল্পতার ব্যাপার তো আছেই। ভাষা নিয়ে লেখকদের দ্বিধাক্রান্ত নিয়তিও আরেক সমস্যা। এদেশে লিখিত মনিপুরি সাহিত্যের প্রকাশকাল বছর ত্রিশাধিক হলেও জাতিসত্তার মূল সাংস্কৃতিক ভিত্তি সামাজিক কৃত্য। বর্ণিল মৌখিক সাহিত্য এখনও জীবিত। লড়াকু যৌথযাপন, ধর্মীয় বোধ, অংশগ্রহণমূলক গান ও নৃত্য ওদের অস্তিত্বের অংশ। ভাষাচর্চায় কিছু বাধা উল্লঙ্ঘনের সুযোগ দিচ্ছে আন্তর্জাল। আমরা আশাবাদী।

– কহ্নৌজম সুরঞ্জিত, চট্টগ্রাম

খোইরোম ইন্দ্রজিৎ

১ কেজি চাউলে শোনা চন্দ্রকলার গান

ছাত্র ভাল। হাতের লেখাও সুন্দর। সবাই প্রশংসা করত। সে সময়। বড়দা মেট্রিক পরীক্ষা দেয়। সে যুগে এ অঞ্চলে যারা মেট্রিক পরীক্ষা পাশ করত তারা ছিল এক দর্শনীয় জিনিস! বড়দার বন্ধুবান্ধবরা যখন মেইতেই কথার মধ্যে ইংরেজি গেঁথে দিত তখন খুব শুনতে ইচ্ছে করত। গ্রামে থেকে মেট্রিক পরীক্ষা পাশ করাটাও সহজ ছিল না। ইংরেজিতে পড়তে হত। গণিতের দু'তিনটা কোর্স, ইতিহাসের দু'টো...। বড়দাকে বাবা সিলেটে পাঁঠায়। মদনমোহন কলেজের এক প্রফেসারের কাছে টিউশনির জন্যে। তখন কলেজ মানেই সিলেট। মৌলভীবাজারে কোনো কলেজ ছিল না। বড়দাকে লেখাপড়া নিয়ে যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তার সহজ উত্তর পেতাম। আসলে এখনও তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে শুদ্ধ ব্যাকরণে লিখতে পড়তে পারেন। এসব বিষয়ে ওর গভীর জ্ঞান। আমি যতটুকু শিখেছি, বুঝেছি তার মূলে মেট্রিক পরীক্ষায় ফেল করা বড়দার কৃপা। আমি পাস করলাম, চাকরি পেলাম। বড়দার এখনও কোনটাই নাই। বাবা বলতেন: 'আান্ধার' মেট্রিক!

'আন্ধার' মেট্রিক নিয়ে বাবার তেমন জ্ঞান ছিল না। প্রথম প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এরপর গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয় শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেট্রিক পরীক্ষা দিতে হত। কথিত আছে: তখন যে গ্রামে মেট্রিক পাস করা লোক থাকত তার পাশ দিয়ে

যাওয়ার সময় ট্রেনের গতি কমে যেত! আর গ্রামটির দিকে আঙ্গুল তুলে যাত্রীরা ঐ বিষয়টি নিয়ে কথা তুলত।

বড়দা আমায় প্রফেসার ও উকিল হওয়ার স্বপ্ন দেখাতেন। লেখাপড়ার ব্যাপারে কড়া শাসন করতেন। মাঝে মাঝে টেবিলের অন্য ধারে বসে পড়া নিতেন। না পারলে করতেন ভীষণ রাগ। মাঝে মাঝে ক্রোধে ফেটে যেতেন। তখন তার তোতলানো স্বভাবটা আরও চাঙ্গা হত। একদিন নিলেন ব্যাকরণের পড়া। কারক, সমাস, বিভক্তি বিষয়ে একটার পর একটা প্রশ্ন। যেন ট্রেনের মতো দৌড়াচ্ছে প্রশ্নের সারি। আমিও আমতা আমতা করে উত্তর দিচ্ছি। কি বলবো আর, রাগে একদম ছারখার। পাশে দিদির কাপড় বোনার তাঁত। বুননকাঠি বের করে যে পিটুনিটাই না দিলেন! কাঠিটা যেই কাছে আসত তখন আমিও টেবিলের নিচে মাথা লুকাতাম। যখন বের করতাম মাথাটা, অমনি তেড়ে আসতো ডান্ডা। অথচ আশ্চর্য, পড়া যাতে তখনি শিখতে না হয় সেজন্যে আমিও কান্না করতাম না।

বাড়িতে কিছুটা কড়াকড়ির ফলশ্রুতিতে স্কুলের শিক্ষকরা কিন্তু আমাকে স্নেহ করত। তখন হাইস্কুলে পড়ি। বিকালে নদীর কিনারে খোলা মাঠে মহিষ চড়িয়ে দিয়ে খেলাধুলা। নদীতে দৌড়ঝাঁপ। বন্ধুদের সাথে। এসব করতাম। একদিন রাতে "মহররম" নিয়ে একটা ইংরেজি পড়া শিখছি। শরীরটা তখন ঢুলুঢুলু। ইংরেজি পড়াটা হঠাৎ দৈবভাষার মত হয়ে যায়। *মহররম ইজ দ্য ফার্স্ট মানথ অব দ্য ইসলামিক ইয়ার*– বাক্যটি বলা শুরু করি জোরে অথচ শেষাংশে আর কোনো শব্দ হত না। সেই সময় প্রায়ই মা আমাকে বিছানায় রেখে আসতেন। মুখে কি সব আবোল তাবোল বলে ঘুমে যেতাম।

রান্না শেষ হলে দিদি আমাকে উঠিয়ে দিলেন। ভাতের থালা সামনে। অথচ আমি কী সব বকছি।

ভাত না খাইয়া পুঞ্জির পুতে কিতা জানি বক বক করে!–বড়দা ধমক দিয়ে বললে হঠাৎ আঁতকে উঠি আমি। মুখস্থ করা ইংরেজি পড়াটা দৈবভাষার মত দ্রুতলয়ে আউড়াতে শুরু করি–

মহররম ইজ দ্য ফার্স্ট মানথ অব দ্য ইসলামিক ইয়ার।

শুধু মাত্র বেঁচে থাকার কোনো মানে নাই। কোনো কিছুর শিখরে পোঁছতে হলে কাজে অধ্যবসায় প্রয়োজন। ভালোভাবে সন্তানদের দেখভাল করাটা জরুরি। গাড়ির যত্ন নিলে পুরোনো গাড়িও নতুন গাড়ির মতোই কাজ দেয়। না হলে সহজেই তারা স্খলিত হয়ে যেতে পারে। অবশ্য তার ব্যতিক্রম আছে...

বেশ কিছু দিন আগে গ্রামোফোনের গানে মাতাল হয়ে উত্তরীয় উপহার দেয়ার চল ছিল। আমার গ্রাম ভানুবিলে শক্তি সিং নামে এক লোক গ্রামোফোন পুষতেন! গান শোনানোর জন্যে গ্রামে গ্রামে সিং সাহেবকে তলব করা হত। সে এক অদ্ভুত চল। শক্তি সিং এর গ্রামোফোন অপারেটরের নাম নয়নবাবু। ৩০/৪০ বছরের যুবক। কিছুটা পোড়খাওয়া বেচারা। একদিন খাঁ খাঁ রৌদ্রের দুপুরে গেলাম অনুরোধ করতে। নয়নদাকে বললে তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, গান প্রতি ১ কেজি চাউল দিতে হবে। বাড়ি থেকে কষ্টে-সৃষ্টে চাল চুরি করলাম। কেজির হিসেবটা ঠিকমতো জানি না তখনো। চালের মটকা থেকে চাল বেশ কমে যেত। গ্রামোফোন রেকর্ডের থালিটা বের করার মুহূর্তে যে কী আনন্দ! সেই আনন্দ স্যাটেলাইট এর এ যুগে খুঁজে পাই না। ঘুরে ঘুরে চাবি দিচ্ছে। পিন লাগাচ্ছে। থালিতে পিন লাগানোর আগেই চাল জমা দিতে বলতো। গামছায় বাঁধা চাল দিলাম। সবেমাত্র গান শুরু হল। বলে কিনা ১ কেজি চালের গান শেষ! চলে যেতে বললে আমার কান্না আসে। তবু চেপে যেতাম কারণ: বাড়ি থেকে যে চাল চুরি করলাম! এবার আমার বন্ধু চাল বের করলে পিন আবার লাগলো থালিতে। সেই ছোট বয়সে শোনা গানটি মনে আছে:

বিলাভ্ড ললিতে, হুম শেল আই টেল ইট, দ্য গ্রিফ দেট শী মাস্ট ইন মাই হার্ট...

চন্দ্রকলার গানটি এরকম ইংরেজিতে শুরু হয়ে মনিপুরি তে মোড় নিত:

কৃষ্ণ-প্রেমের অনলে রাধার দগধ হৃদয়, কারে বলি...-এভাবে ।

চুরি করা চালের দামে শোনা সেই ৬০ দশকের গান হৃদয়ে গেঁথে যেত। তখন এগুলো বুঝি না। তবু কলিটি এখনো ঠোঁটে লেগে আছে।

পরমানন্দে আমি বাড়ি ফিরি। পথে সনাতনের বাড়ি। প্রচুর কোলাহল। কেউ কারো কথা শুনছে না। অবালবৃদ্ধবনিতা মিলে একাকার। গোধূলি বেলা। সনাতনের বাপ কষে থাপ্পড় মারছে স্ত্রীকে! এলোপাথাড়ি লাথি মারে। বলে:

হের নাকি এ বৃন্দাবনে থাকতে মন চায় না!

ঘরের কাজকর্ম গুছিয়ে সনাতনের মা সম্ভবতঃ সান্ধ্যকৃত্যের জন্যে রেডি। না হয় একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। গুন গুন করে নাকি গাচ্ছিল:

থাকিতে চাইনা আর শ্রীবৃন্দাবনে...

ঠিক সেই মুহূর্তেই স্বামী বাড়ি ফেরে। আর এসেই কিছু বোঝার সুযোগ না দিয়ে বউ পেটাতে শুরু করে। বৃদ্ধ বয়েসী স্বামীর ভীমরতি দেখে বউ তো থতমত!

এ রকম কিছুক্ষণ চলতে থাকলে মানুষ জড়ো হয়। সনাতনের বাপ মা আসলেই বৃদ্ধ। এই বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ এরকম ঝগড়া-ঝাটি পাড়া-পড়শিকে সেখানে আসতে প্ররোচিত করে। পিচ্চিরাতো দ্বিগুণ উৎসুক! মনে হয় এ দম্পতি যাদু দেখাচ্ছে! এ অবস্থায় নিজেকে কেন্দ্রে দেখে সনাতনের বাপ বিড় বিড় করে বলে:

এত মধুর বৃন্দাবন...! *এ রকম কইলে তো লক্ষ্মী পালাই যাইব।...তাই বউ বাচ্চারে একটু সামলাইলাম... আর হক্কলে...*

সমবেত পাড়া-পড়শি চুপি চুপি সরে পড়ে।

অনুবাদ: কন্থৌজম সুরঞ্জিত

নোট:

খোইরোম ইন্দ্রজিৎ-এর জন্ম: ১৯৫৫-এ, মৌলভীবাজারের সেই "ভানুবিল" নামের গ্রামে,যা ব্রিটিশ উপনিবেশকালে সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহের জন্যে সুপরিচিত। প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ: *মচু নাইবা মঙ*, কাব্য: *ইন্ন্যফি*। অনূদিত গল্পটির 'মনিপুরি'তে শিরোনাম: *চেং কেজিম্যনা তা'খিবা চন্দ্রকলাগি ইশেই*।